ঈদুল আযহা ও কুরবানী

লেখক

প্রফেসর ড. খন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম. এম (ঢাকা)

সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

যুলহজ্জ মাসে ১০ তারিখে আমরা ঈদুল আযহার সালাত ও কুরবানী আদায় করি। ঈদ শব্দের অর্থ পুনরাগমণ। যে উৎসব বা পর্ব নির্ধারিত দিনে বা সময়ে প্রতি বৎসর ঘুরে ঘুরে আসে তাকে ঈদ বলা হয়। প্রতি সপ্তাহে জুমুআর দিনকে সপ্তাদিক ঈদ বলা হয়। হাদীস শরীফে রসূল (সঃ) বলেছেন যে, ***মহান আল্লাহ আমাদেরকে বাৎসরিক ঈদ হিসেবে দুটি দিন দিয়েছেন: ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন। [আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৯৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪৩৪। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]***

ইসলাম সামাজিক আনন্দ ও উৎসবকে ইবাদত ও জনকল্যাণের সাথে সংযুক্ত করেছে। ঈদুল ফিতরের দিনে প্রথমে ফিতরা আদায়, এরপর সালাত আদায় এবং এরপর সামাজিক আনন্দ, উৎসব ও শরীয়ত সম্মত খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর ঈদুল আযহায় প্রথমে সালাত আদায়, এরপর কুরবানী করা ও গোশত বিতরণ করা এবং এরপর আনন্দ, খেলাধুলা বা বৈধ বিনোদনের নিয়ম করা হয়েছে। যেন আমাদের আনন্দ পাশবিকতায় বা স্বার্থপরতায় পরিণত না হয়।

আমরা ইতোপূর্বে রামাদানের শেষ খুতবায় আলোচনা করেছি যে, ঈদ, কুরবানী, হজ্জ ইত্যাদি সমাজ ও রাষ্ট্র কতৃক পরিচালিত হতে হবে। কেউ কেউ অন্য দেশের চাঁদ দেখার উপর ঈদ করতে চান এবং এভাবে সমাজে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করেন, যা কঠিন হারাম ও অন্যায়। নিজের মতামত এমনকি নিজের চাঁদ দেখার ভিত্তিতেও রাষ্ট্র বা সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের বিরোধিতা করা বৈধ নয়। হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো, চাঁদ দেখলেই ঈদ হয় না, রাষ্ট্র প্রশাসনের নিকট চাঁদ দেখা প্রমাণিত হতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ যে দিন ঈদ করবেন সেদিনেই ঈদ করতে হবে। সাহাবী-তাবিয়ীগণ বলেছেন যে, এক্ষেত্রে ভুল হলেও ঈদ, হজ্জ, কুরবানী সবই আদায় হয়ে যাবে। [ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ২/২৫৬] এক্ষেত্রে ভুলের জন্য মুমিন কখনোই দায়ী হবেন না। এ বিষয়ক দলাদলি বন্ধ করে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরী।

ঈদুল আযহার দিনে গোসল করা, যথাসাধ্য পরিষ্কার ও সুন্দর পোশাক পরিধান করা, এক পথে যাওয়া ও অন্য পথে ফিরে আসা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা জানি। ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে খালিপেটে সালাতুল ঈদ আদায় করতে

যাওয়া সুন্নাত। সম্ভব হলে ঈদের সালাতের পরে দ্রুত কুরবানী করে কুরবানীর গোশত দিয়ে “ইফতার” করা বা ঈদের দিনের পানাহার শুরু করা ভাল।

রসূল (সঃ) সাধারণভাবে সূর্যোদয়ের ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ঈদের সালাত আদায় করতেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, ঈদুল ফিতরের সালাত তিনি একটু দেরী করে সূর্যোদয়ের ১ বা দেড় ঘন্টা পরে পড়তেরন এবং ঈদুল আযহার সালাত একটু তাড়াতাড়ি সূর্যোদয়ের আধাঘন্টা থেকে একঘন্টার মধ্যে আদায় করতেন। আমাদেরও সুন্নাত সময়ে সালাতুল ঈদ আদায়ের চেষ্ট করতে হবে। তবে প্রয়োজনে কিছু দেরী করা নিষিদ্ধ নয়। তবে সর্বাবস্থায় ঈদুল আযহার সালাত একটু আগে আদায়ের চেষ্টা করতে হবে, যেন কুরবানীর দায়িত্ব পালন করে যথাসময়ে কুরবানীর গোশত খাওয়া ও বণ্টন করা সম্ভব হয়।

ঈদুল আযহার অন্যতম ইবাদত “আযহা” বা কুরবানী আদায় করা। রসূল (সঃ) বলেন:

"যার সাধ্য ছিল কুরবানী দেওয়ার, কিন্তু কুরবানী দিল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে উপস্থিত না হয়।" [হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৫৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৬৪। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আলবানী হাসান বলেছেন।]

উট, গরু বা মহিষ, ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা কুরবানী দিতে হবে। রসুল (সঃ) সাধারণত কাটান দেওয়া বা খাসী করা পুরুষ মেষ, ভেড়া বা দুম্বা (ram/male sheep) কুরবানী দিতেন:

রসূল (সঃ) যখন কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন দুটি বিশাল বড় সাইজের সুন্দর দেখতে খাসী করা বা কাটান দেওয়া পুরুষ মেষ বা ভেড়া ক্রয় করতেন। তাঁর উম্মাতের যারা তাওহীদের ও তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করতেন এবং অন্যটি মুহাম্মাদ (সঃ) ও মুহাম্মাদে (সঃ)-এর পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন।" [আবূ দাউদ৩/৯৫; ইবনু মাজাহ ২/১০৪৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/২২০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১। হাদীসটি হাসান।]

এছাড়া তিনি গরু ও উট কুরবানীও দিয়েছেন। গরু ও উটের ক্ষেত্রে একটি পশুর মধ্যে সাত জন শরীক হওয়ার অনুমতি তিনি দিয়েছেন। তিনি স্বাস্থ্যবান ভাল পশু কুরবানী দিতে উৎসাহ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে রোগা, অসুস্থ, খোড়া, কানা ইত্যাদি ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী দিতে নিষেধ করেছেন।

কুরবানীকারী হজ্জে না যেয়েও হজ্জের কর্ম পালনের অর্জনের সুযোগ পান। এজন্যই হাজীর অনুকরণে তাকে কুরবানীর আগে নখ-চুল কাটতে নিষেধ করে রসূল (সঃ) বলেন:

"যদি তোমাদের কেউ কুরবানীর নিয়্যাত করে তবে যুলহাজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখার পরে সে যেন কুরবানী না দেওয়া পর্যন্ত চুল ও নখ স্পর্শ না করে। " ***[মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫৬৫-১৫৬৬]***

হজ্জ ও ঈদুল আযহার কুরবানী ইবরাহীম (আঃ)-এর কুরবানীর অনুসরণ। আজ থেকে প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্বে, খৃস্টপূর্ব ২০০০ সালের দিকে ইরাকের "ঊর" নামক স্থানে ইবরাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা,

পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের সকলের বিরোধিতা ও প্রতিরোধের মুখে তিনি তাওহীদের প্রচারে অনড় থাকেন। একপর্যায়ে তিনি ইরাক থেকে ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ৮৬ বৎসর বয়সে তার দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে তার প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সের এ প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করতে আল্লাহ তাকে নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন:

"অতঃপর যখন তার ছেলে তার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বলল, হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কি অভিমত? পুত্রটি বলল: হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা করুন। ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। অতঃপর যখন তারা উভয়েই আত্মসমর্পন করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম, হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ- স্বপ্নাদেশ পালন করেছ- এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটি সুস্পষ্ট

পরীক্ষা। আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান যবেহের বিনিময়ে। ” [সূরা সাফফাত: ১০২-১০৭ আয়াত]

ইবরাহীম (আ) নবী ছিলেন। এজন্য তার স্বপ্ন ছিল ওহী। স্বপ্নে তিনি দেখেছেন যে, তিনি পুত্রকে কুরবানী করছেন এবং তিনি এবং তার কিশোর পুত্র উভয়েই এ নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। কিন্ত সাধারণ মানুষ কখনোই কোনোভাবে স্বপ্নের উপর নির্ভর করে শরীয়ত বিরোধী কিছু করতে পারেন না। অনেক সময় সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ স্বপ্নের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে শিরক-কুফরের মধ্যে নিপতিত করে। সে স্বপ্ন দেখায়, অমুক মাযারে বা দরগায় মানত কর, ছেলের নাক বা কান ফুড়িয়ে দাও, অমুক দেবতার নামে শিরনী দাও ইত্যাদি। এমনকি যদি কেউ রসূল (সঃ)-কে স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নের মধ্যে তিনি তাকে কোনো শরীয়ত বিরোধী কর্মের নির্দেশ দেন তবে সে তা করতে পারবে না। স্বপ্নে রসূল (সঃ)-কে দেখলে তা সত্য; কারণ শয়তান তার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে ঘুমন্ত অবস্থার শ্রবন ও দর্শন জাগ্রত অবস্থার কর্মের দলীল হবে না। রসূল (সঃ) জাগ্রত অবস্থায় সাহাবীদের মাধ্যমে যে

শরীয়ত দিয়েছেন ঘুমের মধ্যকার শ্রবণ দিয়ে তার বিরোধিতা করা যাবে না।

এখানে লক্ষ্য করুন! পিতা যখন পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিলেন তখনই আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে বললেন, স্বপ্নদেশ পালন করা হয়ে গিয়েছে। কারণ এখানে মূলকথা হলো মনের কুরবানী। ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) মন থেকে আল্লাহর আদেশ মেনে নিয়েছেন। পিতা তার মন থেকে ছেলের মায়া পরিপূর্ণরূপে কুরবানী করে দিয়ে ছেলেকে জবাই করতে প্রস্তুত হয়েছেন। পুত্র তার মন থেকে পিতা পিতামাতা ও দুনিয়ার সকল মায়া কুরবানী দিয়ে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। তাদের মনের এ কুরবানী ছিল নিখাদ। আর এজন্যই শায়িত করার সাথে সাথেই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, তার কুরবানী কবুল হয়ে গিয়েছে। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতী দুম্বা দিয়ে কুরবানীর ব্যবস্থা করলেন।

কুরবানীর মূল বিষয় হলো উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা। নিজের সম্পদের কিছু অংশ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে

দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী করলেই তা প্রকৃত কুরবানী। আল্লাহ বলেন:

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

“এগুলির- অর্থাৎ কুরবানীকৃত পশুগুলির গোশত বা রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাকওয়া তার নিকট পৌঁছায়। এভাবেই তিনি এ সব পশুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করতে পার, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। ” ***[সূরা হাজ্জ: ৩৭ আয়াত]***

তাহলে মূল বিষয় হলো অন্তরের তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাওয়ার আবেগ, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার আগ্রহ। একমাত্র এরূপ সাওয়াবের আগ্রহ ও অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষার আবেগ নিয়েই কুরবানী দিতে হবে। আর মনের এ আবেগ ও আগ্রহই আল্লাহ দেখেন এবং এর উপরেই পুরস্কার দেন। কুরবানী দেওয়ার পর গোশত কে কতটুকু খেল তা বড় কথা নয়।

এ কথা ঠিক যে আমরা নিজেরা ও পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজন সকলেই কুরবানীর পশুর গোশত খাব। পশুটির গোশত সুন্দর হবে, মানুষ ভালভাবে খেতে পারবে ইত্যাদি সবই চিন্তা করতে হবে। কিন্তু গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী দিলে কুরবানীই হবে না। মূল উদ্দেশ্য হবে, আমি আল্লাহর রেযামন্দি ও নৈকট্য লাভের জন্য আমার কষ্টের সম্পদ থেকে যথাসম্ভব বেশি মূল্যের ভাল একটি পশু কুরবানী করব। কুরবানীর পর এ থেকে আল্লাহর বান্দারা খাবেন। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমি ও আমার পরিজন কিছু খাব। আর যথাসাধ্য বেশি করে মানুষদের খাওয়াব। আল্লাহ বলেন:

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“যেন তারা নিজেদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিযক দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম যিকর করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রদেরকে খেতে দাও।” [সূরা হাজ্জ: ২৮ আয়াত]

তাহলে, দুস্থ-দরিদ্রদেরকে খাওয়ানোর আগ্রহ ও উদ্দেশ্য কুরবানীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে একভাগ পরিবারের, একভাগ আত্মীয়দের এবং একভাগ দরিদ্রদের প্রদানের রীতি আছে। এরূপ ভাগ করা একটি প্রাথমিক হিসাব মাত্র। যাদের সারা বৎসর গোশত কিনে খাওয়ার মত সচ্ছলতা আছে তারা চেষ্টা করবেন যথাসম্ভব বেশি পরিমান গোশত দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে। আর যারা কিছুটা অসচ্ছল এবং সাধারণভাবে পরিবার ও সন্তানদের গোশত কিনে খাওয়াতে পারেন না, তারা প্রয়োজনে পরিবারের জন্য বেশি পরিমান রাখতে পারেন। তবে কুরবানীর আগে আমার পরিবার কি পরিমান গোশত পাবে, অথবা বাজার দর হিসেবে গোশত কিনতে হলে বত লাগত এবং কুরবানী দিয়ে আমার কি পরিমাণ সাশ্রয় হলো ইত্যাদি চিন্তা করে কুরবানী দিলে তা আর কুরবানী হবে না।

কুরবানীর গোশত ঘরে রেখে দীর্ঘদিন ধরে খাওয়া বৈধ। তবে ত্যাগের অনুভূতি যেন নষ্ট না হয়। আজকাল ফ্রীজ হওয়ার কারণে অনেকেই কুরবানীর গোশত রেখে দিয়ে বাজার খরচ বাচানোর চিন্তা করি। বস্তুত যথাসম্ভব বেশি

পরিমাণ দান করতে এবং যথা সম্ভব বেশি দরিদ্রকে ঈদুল আযহার আনন্দে শরীক করতে চেষ্টা করতে হবে। এরপর কিছু রেখে দিলে অসুবিধা নেই।

কুরবানী দিতে হবে আল্লাহর নামে। আমরা বাংলায় বলি, অমুকের নামে কুরবানী। আমাদের উদ্দেশ্য ভাল হলেও কথাটি ভাল নয়। এক্ষেত্রে বলতে হবে, "অমুকের পক্ষ থেকে কুরবানী"। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কুরবানী বা জবাই করা শিরক এবং এভাবে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম। উপরের আয়াতে আমরা দেখেছি যে, কুরবানীর পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহর নামের যিকর করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

"প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; এজন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে যে সকল চতুষ্পদ জন্তু রিযক হিসেবে প্রদান করেছেন সেগুলির উপর তারা আল্লাহর নাম যিকর করতে পারে।" [সূরা হাজ্জ: ৩৪ আয়াত]

কুরবানীর ক্ষেত্রে মূল সুন্নাত হলো “বিসমিল্লাহ” বাক্যটি বলে আল্লাহর নাম যিকর করা। বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, রসূল (সঃ) কখনো কখনো শুধু বিসমিল্লাহ বলেই কুরবানী করেছেন। এরপর তিনি কবুলিয়্যাতের দু‘আ করেছেন। সাধারণত তিনি “বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার” বলতেন। কখনো কখনো তিনি প্রথমে “ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বীল আলামীন। লা শারীকা লাহু বি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন” বলতেন। এরপর বলতেন: বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার। এরপর তিনি কবুলের দু‘আ করে বলতেন “আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা”, “আল্লাহুম্মা ‘আন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ”, অথবা “আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতি মুহাম্মাদিন” “আল্লাহ আপনারই জন্য এবং আপনার পক্ষ থেকে। ” “হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে”, “হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন এ কুরবানী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে,

মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে ও মুহাম্মাদের উম্মাতের পক্ষ থেকে। ”

আমাদের ফকীহ গণ উল্লেখ করেছেন যে, কবুলের দুআগুলি জবাইয়োর আগে বা পরে বলতে হবে, যেন, জবাইয়ের সময় আল্লাহ ছাড়া কারো নাম মুখে উচ্চারণ করা না হয়।

আমরা জানি, আল্লাহর নাম হলো “আল্লাহ”। ফকীহগণ লিখেছেন যে, আল্লাহর নাম নেওয়ার নিয়্যাতে শুধু “আল্লাহ”, “আল্লাহুম্মা”, “সুবহানাল্লাহ”, “আলহামদু লিল্লাহ” বা অন্য কোনোভাবে আল্লাহর নাম যিকর করলেই কুরবানী বা জবাই জায়েয হবে। যদি ফারসী, বাংলা বা অন্য কোনো অনারব ভাষাতে আল্লাহর নাম বা নাম সম্বলিত কোনো বাক্য যিকর করে তাহলেও জবাই ও কুরবানী জায়েয হবে বলে হানাফী ফকীহগণ সকল কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

এর অর্থ কী? ফকীহগণের এ সকল বক্তব্যের অর্থ কি এই যে, আমরা সকলেই “আল্লাহ”, “আল-হামদুলিল্লাহ”, “প্রশংসা আল্লাহর”, “আল্লাহ মহান” ইত্যাদি বাক্য বলে কুরবানী করার রীতি চালু করব? এর অর্থ কি আমরা

ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে কুরবানী করব? না আমরা কুরবানীর সময় রসূল (সঃ) কি কতা বলে আল্লাহর নামের যিকর করতেন তা জেনে তার হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করব?

ফকীহদের এ কথার অর্থ হলো, এভাবে আল্লাহর নাম নিলে নূন্যতম নাম নেওয়া হবে এবং কুরবানী হালাল হয়ে যাবে। এর মানে এ নয় যে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করব বা সুন্নাত বাদ দিয়ে "জায়েয"-কে রীতি ও অভ্যাসে পরিণত করব। সাবধান! সুন্নাত বাদ দিয়ে জায়েযকে ইবাদত বা রীতিতে পরিণত করলে তা বিদ'আত হয় এবং তাতে সুন্নাকে অবজ্ঞা করা হয়।

তিনটি কারণে আমরা না বুঝে খেলাফে সুন্নাতে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। প্রথমত, কুরআন-হাদীসের নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা। যেমন, আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর নামের যিকর করে কুরবানী করতে, আর আল্লাহর নাম "আল্লাহ", কাজেই আমি শুধু "আল্লাহ" বলে কুরবানী দেব। আমাদের বুঝতে হবে যে, কুরআনে আল্লাহ যত নির্দেশ দিয়েছেন তা কিভাবে পালন করতে হবে তা শিক্ষা দিয়েছেন রসূল (সঃ)। আমাদের দেখতে হবে রসূল (সঃ) জবাই বা কুরবানীর সময়

কিভাবে আল্লাহর নামের যিকর করতেন। এভাবে কুরআন ও হাদীসের প্রতিটি নির্দেশই রসূল (সঃ)-এর ব্যবহারিক সুন্নাতের আলোকে পালন করতে হবে।

অনুরূপ আরেকটি দলীল হলো রসূল (সঃ) বলেছেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" শ্রেষ্ঠ যিকর, কাজেই আমরা কুরবানী বা জবাইয়ের সময় এ বাক্য বলব। এখানেও একই ভুল। 'আম' বা 'সাধারণ' দলীলকে 'খাস' বা নির্দিষ্ট স্থানে লাগালে বিদ'আত জন্ম নেবে। তিনি যেখানে যে যিকর করেছেন সেখানে সে যিকর করতে হবে। সাধারণ সময়ে সাধারণ ফযীলতের উপর আমল করতে হবে।

বিভ্রান্তির দ্বিতীয় কারণ হলো এক ইবাদতের সুন্নাতকে অন্য ইবাদতে বা অন্য স্থানে দলীল নামে পেশ করা। যেমন, রসূল (সঃ) হজ্জের সময় খালি মাথায় নামায পড়েছেন কাজেই আমি সর্বদা খালি মাথায় নামাজ পড়ব। তিনি নফল নামায দাড়িয়ে পড়া উত্তম বলেছেন কাজেই নফল কুরআন তিলাওয়াত, বা নফল যিকর, বা নফল দরূদ সালাম পাঠও দাড়িয়ে করা উত্তম। তিনি ওয়াজ বা খুতবা দেওয়ার সময় দাড়াতেন, কাজেই ওয়াজ শোনার সময়ও

দাড়াতে হবে। কেউ আসলে তিনি দাড়িয়ে সালাম-মুসাফাহা করতেন, কাজেই আমরা কারো নাম নিতে হলে বা তাকে সালাম দিতে হলে দাড়িয়ে পড়ব। তিনি রামাদানে বা অন্য সময় মাঝে মাঝে জামাতে কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন, কাজেই আমরা সর্বদা তা জামাতে আদায় করব। আমাদের বুঝতে হবে যে, সকল ইবাদতই রসূল (সঃ) নিজে পালন করেছেন। কাজেই প্রত্যেক ইবাদতই তার হুবহু অনুকরণে পালন করতে হবে। তা না করে যদি এক ইবাদতের দলীল অন্য ইবাদতে পেশ করি তাহলে সুন্নাত নষ্ট হবে এবং বিদআতের জন্ম নেবে। হজ্জের ইহরাম অবস্থায় খালি মাথায় নামায পড়াই সুন্নাত, আর অন্য সময় টুপি-পাগড়ী মাথায় দিয়ে নামায পড়াই সুন্নাত। নফল নামায দাড়িয়ে পড়া উত্তম, কারণ তিনি তা শিখিয়েছেন, কিন্তু নফল তিলাওয়াত, যিকর বা দরূদ সালাম দাড়িয়ে পড়া উত্তম নয়, কারণ তিনি তা শেখান নি। বরং তিনি এগুলি বসে বসেই করতেন। নফল নামাযের উপর কিয়াস করে নফল তিলাওয়াত, যিকর বা দরূদ-সালাম দাড়িয়ে পড়া উত্তমে বলে দাবি করলে রসূল (সঃ) ও সাহাবীগণ অনুত্তম কাজ করেছেন বলে দাবি করা হবে।

রামাদানে কিয়ামুল্লাইল ও বিতর জামাতে পড়াই সুন্নাত, অন্য সময়ে তা একাকী পড়াই সুন্নাত। রামাদানের উপর কিয়াস করে অন্য সময় কিয়ামুল্লাইল বা বিতর জামাতে পড়া উত্তম বললে রসূল (সঃ) ও সাহাবীগণ অনুত্তম কাজ করেছেন বলে প্রমাণ করা হয়।

বিভ্রান্তির তৃতীয় কারণ হলো, ফকীহ, আলিম বা বুজুর্গ গণের কর্ম বা কথার দলিল দেওয়া। যেমন বলা যে, অমুক বুজুর্গ করেছেন, বা অমুক তমুক কিতাবে লেখা আছে, শুধু "আল্লাহ" বলে কুরবানী করা জায়েয, কাজেই যারা এ কথা মানে না তারা অমুক গোমরাহ দলের লোক! এখানে সমস্যা হলো জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফকীহদের কথার অর্থ হলো, মাঝে মধ্যে, না জানার কারণে, ভুলে বা অন্য কোনো অসুবিধায় যদি শুধু "আল্লাহ" বা অনুরূপ কোনো শব্দ বলে কেউ জবাই করে তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু সুন্নাত জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করার অর্থই হলো, সুন্নাত অপছন্দ করা। কখনোই যুক্তি, তর্ক বা দলীল দিয়ে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কর্ম, কর্মপদ্ধতিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তর বা সুন্নাতের সমপর্যায়ের বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন না। এতে সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হবে,

যার পরিণতি ভয়াবহ। প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে খুটিনাটি সকল বিষয়ে রসূল (সঃ)-এর হুবহু অনুকরণের চেষ্টা করুন।

আমাদের দেশের মুসলিমদের মধ্যে যত দলাদলি মারামারি তার মূল কারণ হলো, ইবাদত বন্দেগি পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া। আমরা যদি প্রতিটি ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে রসূল (সঃ) ও সাহাবীগণের পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করতে চেষ্টা করতাম এবং সুন্নাতের অতিরিক্ত কর্ম বা পদ্ধতিকে ইবাদতের অংশ না মনে করতাম তাহলে আমাদের অধিকাংশ বিবাদ নিরসন হতো, আমরা সুন্নাত পালনের অফুরন্ত সাওয়াব পেতাম এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সাওয়াবও পেতাম। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।